তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সামনে অসংখ্য চ্যালেঞ্জ

চিররঞ্জন সরকার

অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ ও জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর ড. ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে দেশের রাজনীতিতে স্বস্তি নেমে এসেছে। দেশের এক চরম সংকটজনক সময়ে ড. ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার যাত্রা শুরু করেছে। তাদের সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো দেশে শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজমান রেখে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে যতো শিগগির সম্ভব ক্ষমতা হস্তান্তর। এই চ্যালেঞ্জ তারা কতোটা দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করতে পারেন, তার ওপরই নির্ভর করছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা রক্ষাসহ দেশের ভবিষ্যৎ সবকিছু।

একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়নে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে কতোগুলো অত্যাবশ্যকীয় করণীয় সম্পাদন করতে হবে। একটি নির্ভুল গ্রহণযোগ্য ভোটার তালিকা নিশ্চিত করা, নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন, প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে দলীয় প্রভাবমুক্ত করা, দলীয় বিবেচনায় নিয়োগকৃত নির্বাচন কর্মকর্তাদের অপসারণ– এই ইস্যুগুলো ইতিমধ্যে দেশে গণদাবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এবং এসবের যথার্থতা আন্তর্জাতিক মহলেও স্বীকৃত। বিলম্বে হলেও প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগের আগে রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ জাতির উদ্দেশে দেওয়া সর্বশেষ ভাষণেও একটি অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রাক-করণীয় হিসেবে উল্লিখিত বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। বিদ্যমান ভোটার তালিকাটি 'বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতিতে পরিপূর্ণ' এ কথা স্বীকার করে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, একটি নির্ভুল ভোটার তালিকা ছাড়া নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। 'ইতিমধ্যে প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ ও বিচার বিভাগ, উচ্চ আদালতের ভাবমূর্তি দারুণভাবে ক্ষুন্ন' হওয়ার কথাও স্বীকার করেছেন রাষ্ট্রপতি । এ ছাড়া স্বচ্ছ ব্যালটবাক্স ও ভোটার পরিচয়পত্রের আবশ্যকতা স্বীকার করে কাজগুলো ব্যয়সাপেক্ষ বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। স্বচ্ছ ভোটার বাক্স প্রদানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের আগ্রহের কথা আমরা জেনেছি। এখনো মনে হয় সেই সুযোগ আমাদের হাতছাড়া হয়ে যায়নি। ভোটার কার্ড প্রদান অবশ্যই একটি জটিল প্রক্রিয়া। এই কাজ সূচারুরূপে সম্পাদনের প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা, এমনকি সেনাবাহিনীকে ব্যবহারের পক্ষেও মতামত এসেছে। সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নিয়ে দ্রুত এই কাজ শুরু করতে হবে।

প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হওয়ার কথা রাষ্ট্রপতি বলেছেন। প্রকৃত অর্থেই প্রশাসন আপদমস্তক দলীয়কৃত হয়ে আছে। প্রশাসনে অবশ্যই দক্ষ ও নিরপেক্ষ কর্মকর্তা রয়েছেন, তাদেরকে খুঁজে নিয়ে নির্বাচনে দায়িত্ব দিতে হবে। আর পুলিশ বাহিনীতে শিগগিরই শুদ্ধি অভিযান চালাতে হবে। দলীয় বিবেচনায় ঢালাওভাবে নিয়োগকৃত পুলিশ দিয়ে নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি ভাষণে কিছু বলেননি যদিও, এই অযোগ্য প্রমাণিত, বিতর্কিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করে যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ করতে হবে অনতিবিলম্বে। নির্বাচনের মূল দায়িত্ব পালন করে নির্বাচন কমিশন। কাজেই কমিশনের দক্ষতা-নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে প্রথমেই। এছাড়া নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু করতে পেশিশক্তি-সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও কালো টাকার দৌরাত্ম্যবোধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। ইতিমধ্যেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে আশ্রিত সন্ত্রাসী, দুর্নীতিবাজ গডফাদারদের ধরার ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছে– এটা সময়োপযোগী। আমরা আশা করবো তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাদের করণীয় বুঝে দ্রুতই যথাযথ পদক্ষেপ নেবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে তার করণীয়গুলো সম্পাদন করতে রাজনৈতিক দলগুলোকে আস্থায় নিতে হবে, তাদের সঙ্গে সমঝোতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। সংবাদমাধ্যমকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে।

বিগত সরকারের রাষ্ট্র পরিচালনায় অদক্ষতা, ব্যর্থতা ও দুর্নীতির কারণে সাধারণ মানুষকে সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। তৎকালীন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সিন্ডিকেট করে দ্রব্যমূল্য বাড়ানো হয়েছিল। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ এবং এই সিন্ডিকেট সদস্য ও তাদের গডফাদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করাও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব।

বিগত সরকারের আমলে বিদ্যুৎ উন্নয়নে কোনো উদ্যোগ না থাকায় বর্তমানে দেশে বিদ্যুৎ সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। বিদ্যুৎ সংকট মোকাবিলায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে আশু পদক্ষেপ নিতে হবে।

সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি পরবর্তী নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার দিকে নজর দেওয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ, জাতীয় নিরাপত্তা, পররাষ্ট্রনীতি এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হতে হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে।

শুরুতেই হোঁচট?

ড. ফখরুদ্দীন আহমদের কাছে সকলের প্রত্যাশা ছিল নিরপেক্ষ-যোগ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে তিনি একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবেন। উপদেষ্টা পদে কোনো বিতর্কিত ও দল-ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি নিয়োগ পাবেন না। কিন্তু সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে নতুন উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়েছে, তা সমালোচনার উর্ধ্বে থাকেনি। উপদেষ্টা পরিষদ গঠন নিয়ে যথেষ্ট কালক্ষেপণ করা হয়েছে। এ নিয়ে অনেক গুজব ও কানাঘুঁষা হয়েছে। পাঁচজন উপদেষ্টা দ্রুত নিয়োগ দেয়া হলেও বাকি পাঁচ জনের নিয়োগ নিয়ে দোদুল্যমানতা অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। যাদের নেয়া হয়েছে তাদের সবাই বিতর্কের উর্ধ্বে নন। এর মধ্যে বেশ কজন বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সুবিধাভোগী ছিলেন বলে অভিযোগ আছে। গত পাঁচ বছরে সরকারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে তারা অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাদের সবাই নিজ নিজ পদে সুনাম ও মর্যাদার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। একটি রাজনৈতিক সরকারের সুবিধাভোগী বিতর্কিত ব্যক্তিরা এখন উপদেষ্টা হিসেবে কতটা নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করেন সেটাই দেখার বিষয়। এ ছাড়া উপদেষ্টা নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধান উপদেষ্টা আত্মীয়তন্ত্রকে অতিক্রম করতে পারেননি– এমন অভিযোগও উঠেছে। নতুন উপদেষ্টা পরিষদ কাজের মধ্য দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সব অভিযোগকে মিথ্যে প্রমাণ করবেন –এটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা।

ড. ফখরুদ্দীন আহমদের ব্যর্থ হওয়ার সুযোগ নেই

বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবি ওঠে প্রধানত একটি প্রভাবমুক্ত নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য। বাংলাদেশের বাস্তবতায় একটি দলীয় সরকারের অধীনে অপরাপর দলের প্রশাসনিক, আর্থিক ও কৌশলগত ভারসাম্য একেবারেই সম্ভব নয়। তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে যারাই দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাদের কথিত দায়িত্ব একটি সুষ্ঠু, অবাধ, শান্তিপূর্ণ এবং সম্ভব সকল দলের অংশগ্রহণের একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন করা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় নেয়া।

কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অকথিত অথচ অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব হচ্ছে সকল দলের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে একটি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করা। আমলাতন্ত্র ও পুলিশ যাতে কোনো দল বা ব্যক্তির পক্ষে বা বিপক্ষে ভূমিকা রাখতে না পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের কাজ করা।

কোনো একটি নির্বাচনী এলাকায় অর্থ ও পেশির দাপটে বছরের পর বছর কেউ যদি ত্রাস সৃষ্টি করে মানুষকে কাবু ও জিম্মি করে রাখে, তারা যদি নির্বাচনী কেন্দ্র ধরে ধরে জনে জনে ভোটারদের হুমকি দিয়ে রাখে তেমন একটি এলাকা কেবলমাত্র প্রশাসনিক ও পুলিশি কর্মকর্তা পরিবর্তন করে একটি তিন মাসের তত্ত্বাবধায়ক সরকার জনসাধারণকে ভয়ভীতিমুক্ত করতে পারবে কিভাবে সেটা নিয়ে বিভিন্ন মত থাকতে পারে কিন্তু এর প্রয়োজন নিয়ে মতান্তরের কোনো সুযোগই নেই।

বাংলাদেশের কিছু কিছু এলাকা আছে যেখানে রাজনৈতিক গডফাদাররা বিরোধী দলকে বিগত ৫ বছর দাঁড়াতেই দেয়নি, সাংগঠনিক কাজ করা দূরের কথা। ভুয়া মামলা, শারীরিক নির্যাতন আর চাঁদাবাজি দিয়ে যার যার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। ওই রাজনৈতিক গডফাদাররা নিজ নিজ এলাকায় দলের কর্মীর পরিবর্তে নিজের বাহিনী লালন করেছে।

তারা নিজেদেরকে অনেকক্ষেত্রেই নিজ নিজ এলাকার 'প্রধানমন্ত্রী' পর্যন্ত ঘোষণা করে রেখেছে। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার যদি ওই সমস্ত এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাদের রাজত্ব ধ্বংস না করে তাহলে মানুষের মুক্তি আসবে কী করে? মানুষ নির্ভয়ে ভোট দেবে কী করে?

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় আক্ষরিকভাবে কেবলমাত্র একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ সবার অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজনে সহায়তার কথা বললেও এর প্রেক্ষাপট ও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অর্থ ও পেশির দাপটে বন্দি মানুষের মুক্তির ব্যবস্থা করারও দায়িত্ব দিয়েছে। এটা বিচারপতি হাবিবুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকার একভাবে করেছেন, অন্যভাবে করেছেন বিচারপতি লতিফুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকার। অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার সেখানেই ব্যর্থ হয়েছে। ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর বিএনপি ও জামায়াত অনুভবই করেনি তারা ক্ষমতায় নেই। তারচেয়ে বড় কথা অন্য দলগুলো হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে বিএনপি ক্ষমতাচ্যুত হয়নি।

ড. ফখরুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সুবিধা হলো সকল রাজনৈতিক দল এবার আশা করতে শুরু করেছে বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। আন্দোলনকারী দলগুলো এখনো নিশ্চিত নয়, তারা পর্যবেক্ষণ করছে। মজার ব্যাপার হলো বিএনপিও পর্যবেক্ষণ করছে এবং হিসাব করার চেষ্টা করছে তারা প্রকৃতই ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে কিনা হলে কতোখানি ক্ষমতা হারিয়েছে!

ড. ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সফল হওয়ার সম্ভাবনা এখানেই। এই সম্ভাবনার পরিপূর্ণ রূপায়ন তার সুপরিকল্পিত ও দৃঢ় পদক্ষেপের ওপর নির্ভর করবে। গোটা দেশ তাকিয়ে আছে তার দিকে।

গুজবকে মিথ্যে প্রমাণ করতে হবে

গত কয়েকদিন ধরে বাজারে অনেক গুজব ভেসে বেড়াচ্ছে। একটি গুজব হচ্ছে জরুরি অবস্থা ঘোষণা প্রকৃতপক্ষে সামরিক শাসনে যাওয়ার প্রথম ধাপ। কিছুদিন পরে সামরিক শাসন আসছে। আরেকটি গুজব হচ্ছে ড. ফখরুদ্দীনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার হবে স্বল্পস্থায়ী। তারপরই আসবে তুলনামূলকভাবে দীর্ঘমেয়াদি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। যার নাম হবে জাতীয় সরকার এবং সেই সরকারের প্রধান হবেন সদ্য নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এ সরকারের পেছনে থাকবে সামরিক বাহিনীর সমর্থন আর ভেতরে সুশীল সমাজের অংশগ্রহণ।

গুজবের ডালপালাগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল সামরিক শাসন বা জাতীয় সরকারের সময়ে কিছু বড় বড় সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। চট্টগ্রাম বন্দর ও সেন্টমার্টিন দ্বীপ নেবে যুক্তরাষ্ট্র, এশিয়া এনার্জি আর ভারতের টাটার সঙ্গে হয়ে যাবে ফয়সালা এবং ভারতের স্বার্থরক্ষা করেই এশিয়ান হাইওয়ের পথ নির্ধারিত হয়ে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমরা মোটামুটি ওয়াকিবহাল যে, বর্তমান নবগঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দাতাদের ভূমিকা ও সমর্থনের পাশাপাশি সশস্ত্রবাহিনীর ভূমিকা ও সমর্থন ছিল। এখন সততা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও কাজের মাধ্যমে এসব গুজবকে মিথ্যে প্রমাণ করার দায়িত্বও তত্ত্বাবধায়ক সরকারকেই নিতে হবে। অন্তর্বর্তী এ সময়ে এমন কিছু করতে হবে যাতে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোতে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে নির্বাচন কমিশনকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করা এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। বিচার বিভাগকে স্বাধীন এবং দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে একটি দৃষ্টান্তমূলক অভিযান পরিচালিত করে সামগ্রিক পরিবেশ উন্নয়নের চেষ্টা করতে হবে। সৃষ্টি করতে হবে একটি সত্যিকার সুস্থ, সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ ও সবার অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পরিবেশ। যেখানে সৎ ও যোগ্য লোকের স্থান হবে।

জরুরি অবস্থার জরুরি এজেন্ডা

বর্তমান জরুরি অবস্থার মূল এজেন্ডাই হল, ষড়যন্ত্রের একপেশে নির্বাচনের স্থলে সব দলের অংশগ্রহণে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচনের আয়োজন এবং তা যতদূর স্বল্প সময়ের মধ্যে। তাই বর্তমান জরুরি অবস্থা ও জনপ্রত্যাশার মধ্যে কোনো সংঘাত নেই। নির্বাচন অনুষ্ঠানের পাশাপাশি দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যে অভিযান পরিচালিত হচ্ছে, তা সাধারণ মানুষ অকুণ্ঠচিত্তে সমর্থন করছে। এর কারণ গত জোট সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি ও লুটপাট মানুষের যাবতীয় কল্পনাকে হার মানিয়েছে। তারা জানে, মহাঐক্যজোটকে বাদ দিয়ে কোনোরকম একপেশে নির্বাচন করে আবার ক্ষমতায় গেলে দুর্নীতিলব্ধ অর্থ-সম্পদ রক্ষা করা যাবে, জনরোষের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। জরুরি অবস্থা জারির প্রেক্ষাপটে ২২ জানুয়ারির নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রক্রিয়া স্থগিত হওয়ায় দুর্নীতিবাজ সাবেক মন্ত্রী ও কালো টাকার মালিকদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক অভিযানে তাই তারা শংকিত। সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা, যত দ্রুত সম্ভব একটি স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পাশাপাশি তত্ত্বাবধায়ক সরকার সেনাবাহিনীর সহায়তায় এ অভিযান অব্যাহত রাখবে। অবৈধ পন্থায় অর্জিত সম্পদ রক্ষা করা সহজ নয়– এ ধারণা বদ্ধমূল করা গেলে আগামীতে যারা ক্ষমতায় যাবেন, তারাও সতর্ক হবেন। শুধু গত সরকারের আমলের দুর্নীতিপরায়ণ রাঘব-বোয়াল ও গডফাদারই নয়, অতীতের সব সরকারের আমলে যারা জনগণের সম্পদ লুট করেছে, সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে তাদেরও রেহাই দেয়া সঙ্গত হবে না। গত সরকারের রাঘব বোয়ালদের দুর্নীতির যেসব কীর্তিকাহিনী গত কয়েক মাস এবং এখনো সংবাদপত্রে ছাপা হচ্ছে তা পাঠ করে পাঠক বিস্মিত, শিহরিত। এমনকি গত জোট সরকারের যেসব মন্ত্রী ধোয়া তুলসী পাতা বলে সাধারণ মানুষ মনে করতেন, তাদেরও অবিশ্বাস্য দুর্নীতির কথা এখন শোনা যাচ্ছে। গত ৫ বছরে দেশজুড়ে দুর্নীতির দুর্ভেদ্য ফাঁদ পাতা হয়েছিল। শুধু রাজধানী আর বড় বড় শহরেই নয়, জোট সরকারের নেতাকর্মী ও তাদের আশীর্বাদপুষ্ট লোকজন দুর্নীতির দুর্গন্ধ ছড়িয়ে গত ৫ বছরে গ্রাম-গ্রামান্তরও কলুষিত করে ফেলেছে। ক্ষমতার দম্ভে উন্মত্ত কিছু লোকের সীমাহীন লালসা দেশের অর্থনীতিকে ফোকলা করে ফেলেছে। অসহায় মানুষ প্রতিকারহীন দুর্নীতির নির্মম বাস্তবতার সামনে ভাবলেশহীন স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে থেকে শুধু দীর্ঘশ্বাসই ছেড়েছে। দুর্নীতির অপরাধে এরশাদ জেল খেটেছেন। বর্তমানে যেসব দুর্নীতির কেচ্ছাকাহিনী শোনা যাচ্ছে, এরশাদের দুর্নীতি তার কাছে নস্যিমাত্র। বিগত আওয়ামী লীগ আমলে মন্ত্রী-মিনিস্টার ও তাদের আশীর্বাদপুষ্টরা দুর্নীতি করেনি– দেশের একজন মানুষও একথা বলবে না। সে সময়কার অনেকের দুর্নীতিও ছিল কল্পকাহিনীর মতো। তবে গত জোট সরকারের দুর্নীতির তুলনায় তা অনেক কম।

সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষ করছে, নির্বাচনে সরকার বদল হয়, দুর্নীতিবাজদের সাজা হয় না। কিছু লোভী রাজনীতিকের কারণেই সাধারণ মানুষের কাছে গণতন্ত্র ক্রমশ অর্থহীন প্রতিপন্ন হচ্ছে। এ অবস্থার অবসান একদিনে হবে না, তবে শুরুটা হওয়া উচিত এখনই। নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে সাধারণ মানুষের এ প্রত্যাশা ছোট করে দেখা ঠিক হবে না। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ওপর মানুষের সমর্থন ও সহানুভূতির এটাই মূল কারণ।

নতুন প্রধান উপদেষ্টার প্রতি দেশবাসীর গভীর আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে। এ আস্থা ও বিশ্বাসই তার অপরিমেয় শক্তি। দেশবাসী আশা করে, ড. ফখরুদ্দীন আহমদ তার পূর্বসূরির পদাংক অনুসরণ করবেন না। সংবিধানে বর্ণিত বিধি অনুযায়ী

পরিষদের সব উপদেষ্টার সঙ্গে সলাপরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেবেন। গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলের দুঃখজনক অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে তারা পথভ্রষ্ট হবেন না।

নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ইতিবাচক উদ্যোগ

দায়িত্বগ্রহণের শুরু থেকেই নানামুখী চাপের মধ্যে রয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। সব চাপ সামলে এ সপ্তাহ থেকে পুরোদমে কাজ শুরু করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে। অবশ্য সুষ্ঠু নির্বাচনী পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে নতুন সরকার এরই মধ্যে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ করণীয় নির্ধারণ করেছে। এগুলোর মধ্যে মূল করণীয় হলো নির্বাচন কমিশন সংস্কার, ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা, ন্যাশনাল আইডিকার্ড তৈরি, দলীয় প্রভাব থেকে প্রশাসনকে যথাসম্ভব মুক্ত করা, ভোটের সময় স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহার প্রভৃতি।

বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপের পাশাপাশি অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করার অভিযানও চালানো হচ্ছে। রাজনৈতিক গডফাদার, দুর্নীতিবাজ ও কালোটাকার মালিকদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলা হচ্ছে। উপদেষ্টারা তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়গুলোতে রুটিন কাজের পাশাপাশি সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতি বন্ধ এবং বিগত দিনের নানান অনিয়ম খুঁজে বের করতে তৎপর থাকবেন বলে জানানো হয়েছে। যে সব সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগ রয়েছে তাদের সম্পর্কেও খতিয়ে দেখবে সরকার। এসব উদ্যোগ অবশ্যই ইতিবাচক।

দেশবাসী তাকিয়ে আছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দিকে

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে অনেকগুলো কঠিন কাজ করতে হবে। দুর্গম এক পথ পাড়ি দিতে হবে তাদের। কাজগুলো কঠিন অবশ্যই, তবে অসম্ভব নয়। এসব কাজ যথযথভাবে বাস্ত্মবায়নে প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দীন আহমদ ও তার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের একাধারে নিরপেক্ষতা, আন্ত্মরিকতা ও দক্ষতার পরিচয় দিতে হবে। তবে এসব দায়িত্ব পালনে বিএনপি-আওয়ামী লীগসহ প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সহযোগিতা ও সমর্থন তাদের দরকার হবে। সবার সহযোগিতায় বর্তমানের সংকটময় পরিস্থিতি থেকে দেশকে উদ্ধার করে গণতান্ত্রিক ধারায় ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সফল হোক দেশবাসী এটাই প্রত্যাশা করে।

একথা অনস্বীকার্য যে, সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ এবং সমৃদ্ধ দেশ গঠনে গণতন্ত্রের কোনো বিকল্প নেই। দুঃখের বিষয় হলেও একথা নির্মম সত্য যে, স্বাধীনতার পর একের পর এক সরকার বদল হলেও গণতন্ত্র চর্চায় তাদের আগ্রহ কমই লক্ষ্য করা গেছে। গণতন্ত্রের নামে অপশাসন, দুঃশাসন চলেছে। ব্যক্তিস্বার্থ ও দলীয় স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বলি হয়েছে জনস্বার্থ, দেশের স্বার্থ। তাই গণতন্ত্রের ক্ষীণ ধারাটি মরুপথে পথ হারাচ্ছে। এজন্য গণতন্ত্র দায়ী নয়। যারা গণতন্ত্রের নামে দেশে অবাধ লুণ্ঠন চালিয়েছে, সংসদকে অকার্যকর করে রেখেছে, তারাই দায়ী। তাই পথ হারানো গণতন্ত্রকে নতুন পথের দিশা দিতে হবে। আগামীতে যারা সরকার গঠন করবেন, তারা নিশ্চয়ই একথা মনে রাখবেন।

ঢাকা, ২০ জানুয়ারি ২০০৭

chiroranjan@gmail.com